International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue VI, July 2015, Page No. 33-43
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

অভিজিৎ সেনের ছোটোগল্প : সংস্কারের লোকানুবৃত্তি

বিদ্যুৎ মণ্ডল
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

Avijit Sen started his journey in the world of fictional writings in the decades of six. He noticed that almost writer used to take the background of middle-class society for their writings. He found an undiscovered world of 'Lok' i.e. general people. For the sake of his job he was bound to live at various places of Maldah, Murshidabad and Dinajpur (North and South both). He observed the general livelihood which is very simple and accompanied with multi-superstitions. Their faiths and rituals are very contradictory. Even the men who are enlightened by the modern education also accustomed to obey the superstitions from their sub-conscious mind. This is fact that folk-culture remains with its strong and outspread root in the mind of every man who once spends his life; it may be even a short time. In a word folk-culture stay mixed with blood. Avijit Sen, in his short stories (about 100) has focused this fact. So I have tried to realize the motif of Avijit Sen's writer-mind in this regard.

১

মধ্যবিত্তের বিচিত্র সুখ-দুঃখ বিলাসের কচকচানিতে যখন ভরে উঠছিল বাংলা কথাসাহিত্যের ভাণ্ডার ঠিক তখনই অভিজিৎ সেন বেছে নিলেন আপন গল্পবিশ্বের জগতকে। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের গতানুগতিক ধারাতে আবদ্ধ থাকতে চাননি। তিনি 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে' একটা 'বিকল্প ধরণ' খুঁজতে চান এবং এই 'বিকল্প ধরণ'-এর খোঁজই তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের গতানুগতিক ধারা থেকে প্রস্থান করতে সাহায্য করে। তিনি 'মিথ ও লোককথার সম্ভবনা' প্রবন্ধে লিখেছেন:

> "কল্পকথা, অন্ধবিশ্বাসের জগতে মিথের বসতি। লোককথার জগতে লোকায়ত মানুষ এইসব কল্পকথা, অলৌকিক বস্তু-ব্যক্তি-ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে নিত্য যাতায়াত করে। সেখানকার ঘটনা, চিন্তা এবং বিশ্বাস সেখানকার মানুষের কাছে খুবই প্রত্যক্ষ, খুবই বাস্তব। এই বাস্তবতাকে কিভাবে ধরবে লেখক? কিভাবে এই লোকায়ত মানুষের প্রাকৃতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনাকে দেখাবে লেখক?"[১]

এই জিজ্ঞাসাই তাঁকে 'বিকল্প ধরণ'-এর পথচারী করে। তিনি গল্প-উপন্যাস রচনার নিজস্ব ভুবনটি খুঁজে পান। লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কারের বাস্তবতার বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে আসেন সাহিত্যের আসরে। তিনি 'পঞ্চাশটি গল্প' সংকলনের ভূমিকায় লেখেন:

> "বিচিত্র বিশ্বাস, বিচিত্র আচার-বিচারে আবদ্ধ নানা অপরচিত পেশার মানুষ। এইসব গল্পের অধিকাংশের বয়ান সাহিত্যের অঙ্গনে ইতিপূর্বে অপরিচিত সেইসব মানুষকে নিয়েই।"[২]

অপরিচিত মানুষদের সাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে আসার মাধ্যমে তিনি উপস্থাপনই করতে চান আমাদের দেশের একটি বাস্তব পরিচয়।

প্রত্যেক যুগেই সচেতন সাহিত্যিকদের মধ্যে থাকে প্রচলিত সাহিত্যধারা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা। যেমনটা দেখা গিয়েছিল 'কল্লোল' যুগে। 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকরা রবীন্দ্রভাবনার আদর্শ থেকে সরে আসার আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্যের বিষয় ও পরিধিকে বিস্তৃত করে তাঁরা তাকে কঠোরভাবে বস্তুনিষ্ঠ করতে চেয়েছিলেন ফলে একদিকে প্রাধান্য পেয়েছিল সমাজ-নিষিদ্ধ যৌন আকর্ষণ এবং অন্যদিকে নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনচর্চা যদিও সেই তুলনায় গ্রামীণ জীবনের চিত্রণ খুবই কম। 'কল্লোলগোষ্ঠী'র লেখকরা এই কাজ করেছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে তাঁরা বাস্তবনিষ্ট সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। শুধুমাত্র সমাজের রাজা উজিরদের কথা নয়, সমস্ত ভালোমানুষের কথা নয়, তার বাইরেও যে আর একশ্রেণীর মানুষ বাস করে তাঁদের কথা বলা দরকার। এই তাগিদ থেকেই তাঁরা একটা স্বতন্ত্র পথ খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন। অপরদিকে প্রায় কল্লোলের সমকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যে আর্বিভূত হলেও 'কল্লোল্গোষ্ঠী'র দ্বারা প্রভাবিত হন না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিকদের ভাবুকতায় দেখেছেন গ্রামবাংলার প্রকৃতিকে এবং খুঁজে পেয়েছেন গল্প রচনার উপাদান। তিনি প্রকৃতি-লালিত মানুষদের নিয়ে গড়ে তোলেন তাঁর গল্পবিশ্ব। কল্লোলীয়দের যে আধুনিকতা তার থেকে সরে আসেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তিনি রাঢ়বাংলার মানুষদের বিশ্বাস ও সংস্কারকেই করেন সাহিত্যের বিষয়। তিনি তাঁর গল্পের বয়ানে যে বাস্তবতাকে তুলে আনেন তাতে আমাদের দেশের একটা অপরচিত জগৎ উঠে আসে এবং তা ছিল শিক্ষিত ভদ্রসমাজের বিপরীতে আর এক জগৎ। তারাশঙ্করের পরে আর কোনো গল্পকার বিশেষ করে পাঁচ-ছয়ের দশকের গল্পকারেরা গল্প রচনার বিষয় হিসেবে এই জগতটাকে বেছে নেননি। তাঁদের গল্প রচনার বিষয় হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের সামাজিক সংকট, জীবন-যাপনের সংকট, মানুষে মানুষে সম্পর্কের টানাপোড়েন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সচেতনভাবে 'কল্লোলগোষ্ঠী'র প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন মিথ ও লোককথার বাস্তবতার জগতে অভিজিৎ সেনও সেইরকম লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কারের মধ্যে খুঁজে পান তাঁর সাহিত্যের 'বিকল্প ধরণ'।

লাতিন আমেরিকার কথাসাহিত্যিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর নোবেল পুরস্কারের ভাষণে বলেছিলেন:

> "ইউরোপীয়রা আমার বই পছন্দ করেন, আমার রচনায় তারা ম্যাজিক ফ্যান্টাসি দেখতে পায় বলেই। আসলে কিন্তু আমার রচনা সে সব কিছু নয়। লাতিন আমেরিকান বাস্তবতা মানেই আমাদের নিত্যদিনের বাস্তবতা। অর্থাৎ সরল আর নিষ্পাপ চোখে বাস্তবের দিকে সোজাসুজি দেখা। ম্যজিক রিয়ালিজম মানে আমাদের বাস্তবতার ভেতর তার অলৌকিকতা আর আশ্চর্যময়তা। ইউরোপীয়রা যতটা যুক্তিবাদী সে অর্থে আমাদের মন মানসিকতা ততটা যুক্তিবাদী নয়। হওয়া সম্ভবও নয়। আমরা যেভাবে আমাদের বাস্তবতাকে প্রকাশ করি, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি, যুক্তিবাদীদের পক্ষে সেটাকে ঠিক সে ভাবে বোঝা বা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। লাতিন আমেরিকানদের দেখে মনে হবে তারা অর্ধেক স্বপ্ন আর অর্ধেক দুর্নীতির ভেতর জীবন কাটান, সদ্‌বাস্তবতা যাদের সহজাত ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।"[৩]

লাতিন আমেরিকার মতো ভারতবর্ষও তৃতীয়বিশ্বের দেশ। সেখানে যুক্তিবাদিতার বাইরেও যে সদ্‌বাস্তববাদ আছে যার কথা তারাশঙ্কর বন্ধ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী ব্যতীত অন্য কোনো কথাসাহিত্যিকদের রচনায় সেইভাবে পাওয়া যায় না। অথচ গ্রামে গড়া এই ভারতর্ষের শুধুমাত্র যুক্তিবাদীদের কথা বললে সবটা বলা হয় না। তার বাইরেও যে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের জগৎ আছে তার কথা বলা দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই বিশ্বাস-সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না। সেই কাজের দায়িত্ব নেন অভিজিৎ সেন। এখানেই তিনি হয়ে ওঠেন বিকল্প পথের পথিক, যা তাঁকে সমকালের অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার বলতে বোঝায় আমাদের সমাজ আদিকাল থেকে যে সমস্ত ঘটনায়, আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করে আসছে। যেখানে সংস্কারের আধিক্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত হয়ে যায় এবং ঘটে ব্যক্তির চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি। যার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না অথচ সেই বিশ্বাসের জগতের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যেই শুধু নয়, তথাকথিত শিক্ষিত শহরাশ্রয়ী মানুষের অবচেতন মনেও কিভাবে লোকবিশ্বাসের জগতে বাস করে তার পরিচয় পাওয়া যায় অভিজিৎ সেনের গল্পে। অভিজিৎ সেনের গল্প বিশ্লেষণ করে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি হাজার বছর ধরে বয়ে আসা এই বাঙলার সমাজদেহে বয়ে চলেছে লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কারের রক্তস্রোত।

২

আমরা দেশজ পরম্পরার বিপরীতে যে ভিন্ন পরম্পরা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম তাতে আমাদের সম্পূর্ণতা সাধিত হয়নি। আমাদের অতীত ঐতিহ্যের শিকড় যে কত গভীরে প্রোথিত, তাঁকে অস্বীকার চেষ্টা করলেও যে অস্বীকার করা সম্ভব নয় তাকেই প্রকাশ করেন অভিজিৎ সেন। অতীত ঐতিহ্যের শিকড় বলতে এখানে বোঝাতে চেয়েছি আমাদের সংস্কারকে। অভিজিৎ সেন যখন তাকে গল্পের বিষয় করে তোলেন তখন তা আর নিছক গল্প থাকে না তা হয়ে ওঠে আমাদের নিজেকে দেখার দর্পণ। স্মরণ করায় আমাদের উৎসভূমিকে।

'ব্রাহ্মণ্য' গল্পটিতে আমরা যারা আজকের দিনে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতী নিজেদেরকে দেখতে পাই। আমরা যারা একসময় ভাবি যে মন থেকে সমস্ত সংস্কার মুছে ফেলেছি কিন্তু তা যে আমাদের অবচেতন মনে রয়ে গেছে তার কথা বলেন অভিজিৎ সেন গল্পের দ্বিবাচনিকতায়। গল্পটি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নচিকেতা ও কেতকীর গল্প। গল্পটিতে একদিকে আছে রাইনগরের বাসিন্দা মহাদেব ও তার পরিবার, এমনকি ওই অঞ্চলের সমস্ত মানুষের কথা যারা লোকবিশ্বাস-সংস্কারের জগতে নিত্যদিন বাস করে। অপরদিকে আছে শিক্ষিত মন নিয়েও অবচেতন মনে জমে থাকা সংস্কারের নিগড় ভেঙে বেরিয়ে আসতে না পারা নচিকেতা ও কেতকীর কথা।

বরিন্দের মানুষ বিশ্বাস করে কোনো ব্রাহ্মণ তাদের বাড়িতে গেলে কিংম্বা ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে পারলে পুণ্য অর্জন হয়। নচিকেতাকে সেই আশাতেই মাহিষ্য মহাদেব তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে। নচিকেতার কথাতেই বরিন্দের মানুষের সংস্কারের কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> "কে জানত বরিন্দের এই দুর্গম অঞ্চলে পরিত্যক্ত নদীখাত, প্রাচীন জাঙ্গাল আর বর্ষায় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা নদী-নালার বাঁকে বাঁকে মাহিষ্য, সদগোপ, কৈবর্ত, তন্তুবায়, তামলী, বারুই ইত্যাদি উত্তম ও মধ্যম সংকর সমাজের তলার গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ পুণ্যার্জনের আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে আশির দশকেও অপেক্ষা করে আছে নচিকেতার জন্য?"[৪]

মহাদেব তার পরিবারের কোনো মেয়েকে পানের বরজে ঢুকতে দেয় না। কারণ পানের বরজে মেয়েরা প্রবেশ করলে বরজের ক্ষতি হতে পারে অথচ ব্রাহ্মণ নচিকেতার স্ত্রী কেতকীকে পানের বরজে ঢুকতে দিতে কোনো বাঁধা নেই। মৃত্যু পথযাত্রী মহাদেবের স্ত্রীর মাথায় কেতকীর পায়ের ধূলা দেয় এক প্রৌঢ়া। তাদের বিশ্বাস শূদ্রাণীর মাথায় ব্রাহ্মণীর পা ছোঁয়ালে সে স্বর্গবাসী হবে। এই হল বরেন্দ্রভূমির মানুষের বিশ্বাসের জগৎ। তারা এই বিশ্বাসের মধ্যে নিত্যদিন বাস করে।

'ব্রাহ্মণ্য' গল্পের প্রধান বাচনটি হচ্ছে আমাদের অবচেতন মনের ভূমিতে সঞ্চিত জাত-পাতের সংস্কার যে কত গভীর তাকে প্রকাশ করা। যা প্রত্যক্ষ বাস্তবতার বিপরীতে আর এক বাস্তবতা। নচিকেতা বা কেতকী কেউই হয়তো কোনোদিন জানতে পারত না যে তারাও বরেন্দ্রভূমির মানুষের মতো মনের অবচেতনে লালন করে চলেছে হাজার বছর ধরে বয়ে আসা সংস্কারকে যদি না রাইনগরের মহাদেবের পরিবারের সঙ্গে তাদের পরিচয় হত।

নচিকেতা ব্রাহ্মণ সন্তান, কেতকী সদগোপ কন্যা। তারা সত্তরের দশকে কলেজস্ট্রিট পাড়ায় কাটিয়েছে কলেজ-জীবন। সেই মতো তাদের বোধ-বুদ্ধি গড়ে ওঠে। তারা রেজিস্ট্রি বিয়ে করে। সেখানে কোনো সমস্যা দেখা দেয় নি। সমস্যা তৈরি হয় নচিকেতার বাড়িতে। নচিকেতার মা কেতকীর হাতে জল খেতে চান না, তিনি বলেন-"আমার সংস্কার তোমার হাত থেক জল নিতেও আটকাবে।" নচিকেতা বলেছে "আসলে মা বোধ হয় নিজেও জানতেন না যে কত গভীরে রয়েছে তার জাতের শিকড়।" এই জাতের শিকড় শুধু নচিকেতার মা কিম্বা বাবার মধ্যেই প্রবল নয়, নচিকেতা ও কেতকীর অবচেতন মনেও তা রয়েছে। তাদের অসবর্ণ বিয়ে নিয়ে তার বাবা কোনো কথা না বললেও 'সংস্কারের আঘাত এড়াতে পারেন নি'। আর সেই জন্যই 'অত্যন্ত সংগোপনে নচিকেতা নিজেকে দায়ী করে বাবার অকাল মৃত্যুর জন্য'। নচিকেতা উপলব্ধি করতে পারলেও কেতকী পারে না। কিন্তু তার বোঝা উচিত "জাতপাতের ঘৃণপোকা বাঙালি চেতনাতেও যে খুব কম দুর্বল নয়।" কেতকীর কিছু ভাবনা ও সংলাপ থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি কেতকী না বুঝেও তার কেতাবী মস্তিষ্কে 'জাতপাতের ঘৃণপোকা'কে পালন করে চলেছে। নচিকেতার মা তার হাতে জল খায়নি বলে কেতকী আহত হয়, সে চায় নচিকেতা তার হয়ে মায়ের এই আচরণের প্রতিবাদ করুক। কিন্তু নচিকেতা তা না করে কেতকী পাল্টা প্রশ্ন করে:

> "যদি আমি না হয়ে কোনও হরিজনের সঙ্গে বিয়ে হত তোমার, জল খেতেন তোমার মা তার হাতে? তুলনার তীব্রতায় আঁতকে ওঠে কেতকী। তারপরে সে বলে আমরা হরিজন নাকি? কি সব বাজে বকছ?"[৫]

কিংম্বা শৈল রায় যখন কেতকীকে 'বেজাতের মেয়ে' বলে তখন তার সংস্কার ভয়ানকভাবে আহত হয়। গল্পকারের ভাষায়:

> "তারা উচ্চবর্ণের কায়স্থ ঘোষ, অথচ এই লোকটা তাকে বেজাতের মেয়ে বলতে দ্বিধা করল না। তার অহঙ্কার ভয়ানকভাবে আহত হয়েছিল।"[৬]

অথবা যখন জনৈক সন্তোষ কুমার মিত্রের চিঠিতে কেতকীর প্রকৃত কুলপরিচয় প্রকাশিত হয় তখন কেতকীর উপলব্ধি:

> "যেন ঘৃণ্য, যেন তা তার নৈতিক চরিত্রে নিন্দা আরোপের থেকেও অধিক শক্তিশালী, কোনও কলঙ্ক সারা দেহে মুখে কেউ নিক্ষেপ করেছে এমন অশুচি লাগতে থাকে নিজেকে।...তার মনে হতে থাকে এসব কথা বোধ হয় মিথ্যা নয়। তার বাল্যকাল থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত তাদের বাড়ির জাতপাত বিষয়ক যাবতীয় কথাবার্তা, আচার-আচরণ ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে এমন কতকগুলি সমস্যাকে দেখতে পায়, যেগুলোর সমাধান হয়নি।"[৭]

কেতকীর এই সমস্ত কথাবার্তা ও ভাবনা তার সংস্কারের শিকড়ের গভীরতাকে দেখিয়ে দেয়। সেই জন্যই সে ভয় পেতে থাকে। তার মনে 'আশঙ্কা জন্মায়'। নচিকেতার পৈতে কিনে আনাতে ভাবতে থাকে- 'এবার থেকে আবার পিছনে হাঁটাশুরু করবে নাকি সে? পৈতে? তারমানে বামনাই!' কিম্বা 'অশিক্ষিত চাষী পরিবারগুলোর ক্রমাগত ভক্তি হওয়া', 'পায়ের ধূলো নেওয়া', 'নচিকেতা কি আবার তার উৎসে ফিরে যাবে নাকি?'

নচিকেতা উৎসে ফিরে যায় না। কিন্তু সংস্কারের উৎসস্থলে তার অবস্থান, এই উপলব্ধি তার আছে। সেই জন্যই কেতকীকে সে বলতে পারে:

> "আমরা কেউ এত সহজে পাল্টাই না। আমি কি জানতাম নিজেকে এভাবে আড়াল করবার এমন একটা মুহূর্ত আসতে পারে জীবনে? ব্রাহ্মণ্য ভণ্ডামি, ব্রাহ্মণ্য অনাচার আমি অস্বীকার করলেই সমাজ থেকে উবে যাবে না।"[৮]

মহাকালের এই বাচনটি কেতকীর মতো কেতাবী বুদ্ধির আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না বা বুঝতে চাই না। এই সত্যটিকে প্রকাশ করার জন্যই এই গল্পের পাঠকৃতি নির্মাণ করেছেন অভিজিৎ সেন। যে নচিকেতা চেয়েছিল কলকাতায় তাদের ছেলে একজন যথার্থ আধুনিক মানুষ হোক, সেই নচিকেতা যখন উপলব্ধি করল যে আমাদের সংস্কারের টান আমরা কোনোভাবেই এড়াতে পারব না, তখনই 'কলকাতায় পড়ে থাকা তাদের শিশুটির জন্য নচিকেতার মন হঠাৎ হু হু করে ওঠে।'

মহাদেব ও তার পরিবার যে লোকসমাজের মধ্যে বাস করে সেখানে ব্রাহ্মণে ভক্তি হওয়া, ব্রাহ্মণীর পায়ের ধূলো নেওয়া, মেয়েদের পানের বরজে ঢুকতে না দেওয়া প্রভৃতি সংস্কারে বিশ্বাস থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু নচিকেতা ও কেতকী যে পরিমণ্ডলে বাস করে তাদের যে শিক্ষা-দীক্ষা, বোধ-বুদ্ধি সেখানেও তাদের চেতনার গভীরে জাতপাতের বিভাজনের সংস্কার কিভাবে কাজ করে যায় সেই সত্যটিকেই আমাদের জানিয়ে দেন কথকশিল্পী। তার জন্যই তো নচিকেতা কোনো সময়ে পৈতে ব্যবহার না করলেও বারিন্দের মানুষের জন্য তাকে পৈতে ব্যবহার করতে হয়। শেষ পর্যন্ত এই গল্প আর নচিকেতা কেতকীর গল্প থাকে না; তা হয়ে ওঠে আমাদের সবার গল্প।

এই গল্পের প্রসঙ্গে মনে আসে 'বখিলা' গল্পের কথা। এই গল্পেও আছে দুটি কাহিনি, একটি বেদেদের যাযাবর জীবনের কাহিনি, অপরটি নিঃসন্তান অনুশীলার কাহিনি। সে তার স্বামি সমরোণের সঙ্গে বাস করতে থাকে 'শহর থেকে স্বজন থেকে নির্বাসিত এক দ্বীপের মতো মামার বাড়িতে।' অনুশীলার সন্তান না হওয়ার জন্য তাঁকে নানা গঞ্জনা সহ্য করতে হয় 'যে জায়গাটা তার শিক্ষা-দীক্ষা রুচির অগোচর ছিল।' এই অগোচরীভূত জাগয়াটাই কথাকার আমাদের দেখিয়েছেন।

যে 'অনুশীলার ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। কোনও মন্দির বিগ্রহের সামনে সে নত হতে তখনো শেখেনি। কখনো হবে এমন দুশ্চিন্তা তার ছিল না'। বেদের মাদুলি কোমরে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াবার মত মানসিক অধঃপতন' যার ছিল না। সেই অনুশীলাও একদিন 'খুব সংগোপনে রঘুনাথের কাছে মানসিক' করে সন্তান কামনায়। কারণ সেও বুঝতে পারে:

> "সন্তানবতী হওয়ার প্রাগৈতিহাসিক অহংকার তার শিক্ষিত আধুনিক রক্তেও কম প্রবল নয়। এই মহৈশ্বর্যের ভাণ্ডারে সংশয় দেখা দিলে তার শিকড়ে যেন টান লাগবে।"[৯]

বেদেনী দলের কুশ্রী মুক্কির মা যে সত্য উপল্পব্ধি করতে পারে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনুশীলা সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। সেই জন্যই মুক্কির মা যখন তাকে মুক্কির ছেলেকে নিতে বলে যুক্তি দেখায়:

> "নিজের রক্তের ঢেলা আর পরের ছেলের তফাৎ কেছু হয় না যদি ঠিক ঠিক পালা পোষা কর, দিদিমণি। গু ছানো, মুত ছানো মারোধরো, রাগমান কর, রোগে শোকে শিয়রে বইসে রাত জাগো সুখে বুক্যে হামলাও ছোল তোমার হবে।"[১০]

তখন কিন্তু অনুশীলা মুক্কির ছেলেকে নিতে পারে না। তার কোনো সন্তান নেই, সে তো আধুনিকা নারী তবুও তার বাধে। কেননা সে তার সংস্কারের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। সামাজিক দিক থেকে সে তো অনেকটা উঁচুতে অবস্থান করছে, সুতরাং তার পক্ষে বেদেনীর ছেলেকে কোলে তুলে নেওয়া সম্ভব হয় না। এমনই সংস্কারের শিকড়, যা তার চেতনার গভীরে রয়ে গেছে।

মুক্কি সাপে কেটে মারা যাবার পর, মুক্কির ছেলেকে অনুশীলাদের কোয়াটারের সামনে রেখে দিয়ে যায় তখনও অনুশীলা তাকে নিতে পারে না। খামার বাড়ির কাজের মেয়ে মালা, সেও নিঃসন্তান। কিন্তু সে অবলীলাক্রমে বেদেদের পরিত্যক্ত ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করতে পারে:

> "বেবাক মাইনষে শুইনে রাখেন ই বাইদ্যার চ্যাংড়া আইজ থিকা মোর হইল হয়। বাবা রঘুনাথ মোর কোলেৎ ই চ্যাংড়াক পাঠালেন হয়।"[১১]

অনুশীলাও তো রঘুনাথের কাছে সন্তান কামনায় মানত করেছিল, তবুও সে তো সে মালার মতো স্পষ্ট ঘোষণা করতে পারে না।

'নদীর মধ্যে শহর' গল্পের কথাও বলা যায়। এটি বিনয়ের গল্প। তবে এই গল্পে সমাজের দুই শ্রেণির কথা বলা হয়েছে। গল্পকথক জয়দেবের শ্রেণি আর এক মেথরদের শ্রেণি। যে বিনয় শান্তিনিকেতন থেকে পড়াশোনা করেছে সেই বিনয় আজ মেথর পল্লীতে বাস করছে মেথরদের মেয়ে মহারাণি বাঁশফোড়কে বিয়ে করে। মেথরদের মেয়েকে বিয়ে করেও বিনয় কি মেথর হতে পেরেছে? মেথররা কি বিনয়কে নিজেদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে? এই জিজ্ঞাসা থেকে গল্পটি গড়ে উঠেছে।

বিনয়ের বাবারও রক্ষিতা ছিল। কিন্তু বিনয় যে কাজ করে, তার বাবা সেই কাজ করেনি। বিনয়ের বাবার সময় থেকে বিনয়ের সমাজ শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে অনেকটা এগিয়েছে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যে সমস্ত সংস্কার রয়ে গেছে তাঁর থেকে কি আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি? তাই মেথরের মেয়েকে বিয়ে করে কিন্তু হোঁচট খেতে হয় বিনয়কে। মেথরের মেয়েকে বিয়ে করায় সে তাদের পুরনো বাড়িতে ফিরতে পারে না সমাজ ও স্বজনদের প্রবল বাঁধা থাকায়। শেষ পর্যন্ত তাকে উঠতে হয়, 'হাসপাতালের ঝাড়ুদারদের ভাঙাচোরা কোয়াটারে।'

বিনয় একদিন তার বাল্যবন্ধু জয়দেবের বাড়িতে পাড়ার ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য চাঁদা চাইতে গেলে জয়দেব তাকে তাদের সমাজে ফিরে আসতে বলে তখন বিনয় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়:

> "জয়দেব আমি আর তোমাদের লোক নই।...তোমরা আমাকে অনেক আগেই ত্যাগ করেছ। আমি মেথর! আমি এখন মলভাণ্ডের পাশে বসে খেতে পারি! নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারি কুকুরকে জড়িয়ে ধরে! স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করতে পারি! আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে অন্যপুরুষের সঙ্গে চলে যেতে পারে! তোমাদের এটা শুধু পুরুষরাই পারে, যেমন আমার বাবা করেছিল। কিন্তু আমি তাকে ধরে এনে মেরে রক্তাক্ত করতে পারি এবং তারপরে মদ খেয়ে দুজনে হল্লা করতে পারি! এসমস্ত কিছুর পরে দুজনে উন্মাদের মত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারি!"[১২]

বিনয় এখানে মেথর জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু সে তো পারেনি মহারাণি বাঁশফোড়েকে ফিরিয়ে আনতে। মেথরদের সমাজ কি তাকে গ্রহণ করতে পেরেছে? পারেনি। যদি বিনয় মেনে নিতে পারত কিম্বা মেথরদের সমাজ বিনয়কে মেনে নিতে পারত তাহলে গল্পের শেষে আমরা বিনয়ের যে পরিণতি দেখতে পাই তা দেখতে হত না।

শুধুমাত্র বিনয়ের সমাজ বা মেথরদের সমাজই নয়; তার থেকেও খারাপ আর্থির অবস্থার ঝিপাড়ার মানুষের বিনয়ের মেথরের মেয়েকে বিয়ে করা বা মহারাণি বাঁশফোড়কে বিয়ে করা মেনে নিতে পারে না। সেই কারণেই কি ঝি পাড়াতে বাস করতে গিয়েও তাদের একঘরে হয়ে থাকতে হয়। এক্ষেত্রে এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমাদের প্রত্যেকেরই সামজিক অবস্থান নির্দিষ্ট। আমরা যতই চেষ্টা করি না আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না, যেমনটা পারে বিনয় বা মহারাণি বাশঁফোড়ে। এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন গল্প-কথক 'আমি' তাই তো তিনি বলেন-

> "শেষবার বিনয় বড় অহংকারের সঙ্গে বলে এসেছিল "আমি মেথর", কিন্তু মেথর সে হতে পারেনি, আবার মহারাণিকেও বের করে আনতে পারেনি ওই পরিমণ্ডল থেকে। এসব সম্ভবই না। সমাজে যার যেখানে অবস্থান তাকে সেখানেই থাকতে হবে। এইটাই নিময়।"[১৩]

অসম্ভব সংবেদনশীল বিনয় ভুলে গিয়েছিল এই নিময়। কিন্তু বিনয় ভুললেও আমাদের সমাজ কাঠামো তা ভোলেনি। সেই কারণেই এমন মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বিনয়ের।

'কলাপাতা' গল্পটিও দাঁড়িয়ে আছে জাত্যাভিমানের উপর। গল্পটি 'আমি'র জবানীতে বলা ব্যাঙ্ককর্মী শিবুর গল্প। শিবুর মধ্যে জাত্যভিমানের সংস্কার প্রবল মাত্রায় দেখা যায়। যদিও সেই সময় রামমন্দির ও বাবরি মসজিদ বিতর্ক উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে জাত্যভিমানের প্রাবাল্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিবুর প্রতিস্পর্ধী হিসেবে এসেছে হানিফ মাস্টার। এই গল্পে শিবুর যে পরিণতি দেখানো হয় তা খুবই দুঃখজনক।

ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথেবাসের মধ্যে এক মুসলমানশিশু শিবুর গায়ে বমি করে ফেলায় শিবুর মনে হতে থাকে তাঁর জাত নষ্ট হয়েছে। তাই সে বাড়ি গিয়ে 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এনে মাথা নাড়া করে গোবর খেয়ে শাস্ত্র মতে প্রায়শ্চিত্ত' করেছে। তাতেও তাঁর মনে হতে থাকে সে শুদ্ধ হতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে শুদ্ধ হয়। আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের আগে এমনকি ঔপনিবেশিক শাসনের আমলেও এই ধরণের ধর্মীয় বিরোধ দেখা যেত। অথচ পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও আমরা আমাদের মধ্যে থেকে যাওয়া সংস্কারকে এড়াতে পারিনি। হানিফ মাস্টারের হিদুর সংজ্ঞা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গল্পকথক 'আমি'র উপলব্ধি হয়:

> "হানিফের শেষ কথাটা এবং হাসির মধ্যে যে শ্লেষ এবং স্বধর্ম সম্পর্কে যে অহঙ্কারের প্রদর্শন ছিল তা আমাকে বিদ্ধ করল। আমি নিজে কোনও ধরনের ধর্মাচরণ করি না। আমার স্ত্রী সন্তানেরর' এসবের বাইরে থাকে। তবুও হানিফের এহেন উক্তিতে আমি ভীষণ আহত হলাম সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম না। তবে মাথার মধ্যে কেমন ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।"[১৪]

এই উপলব্ধি শুধুমাত্র 'আমি'র একার নয়, তা আমাদের সবারই। সেই জন্যই ত আমরা আজও রামমন্দির বাবরি মসজিদের মতো বিতর্কে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছি।

৩

অভিজৎ সেন মানুষের অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা লোকসংস্কারের বাস্তবতার কথাই বলেন না, যে সমস্ত মানুষ লোকসংস্কারের বাস্তবতার মধ্যে বাস করে তাদের কথাও বলেন। তিনি অনেকগুলি গল্পে দেখিয়েছেন কিভাবে এই সংস্কার তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা আশা-আকাঙ্খা, সুখ-সাচ্ছন্দ্য সমস্ত কিছুর জন্য নির্ভর করে সংস্কারের উপর। এইরকম সংস্কারের বাস্তবতা নিয়ে রচনা করেন 'দেবাংশী' গল্পটি। 'দেবাংশী' গল্পটি যে অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে রচিত তারা বিশ্বাস করে দেবাংশীর ভর হলে তাকে ছুঁতে নেই, স্বয়ং দেবতা তার শরীরে ভর করে থাকে। 'তার কথা দৈববাণী' হয়ে যায়। "কালী কিম্বা মনসা থানের এক চিমটা মাটি তখন অসাধ্য সাধন করতে পারে দৈবী মহিমায়। যক্ষ্মা, হাঁপানি, কুষ্ঠর মতো রোগও সেই মাটি ধোওয়া জল খেলে সেরে যাবে। বন্ধ্যা রমণী সন্তানবতী হবে, পঙ্গু নিজের পায়ে হাঁটবে, অন্ধ এই পৃথিবীর আলো, বৃক্ষলতা সব দেখবে। বুজে যাওয়া পুষ্করিণী জলে মাছে কেলি করবে, বাঁজা গাই তার দুপুরে ডাক তুলবে পাড়া কাঁপিয়ে, যে গাইয়ের বাছুর মরে দুধের অভাবে, তার মরা ওলানে দুধের বান ডাকবে। সাপ, বিছা, ভূত-প্রেত, মাদার আর জিনের কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে কোলের শিশু পোয়াতি স্ত্রীলোক। মায় যে সব লাউ-কুমড়ো যেসব ঝাঁকায় কেবল জালি আসে আর মরে যায় সেসব গাছও ফলভারে ঝাঁকা ভেঙে ফেলতে চাইবে।"[১৫] 'লোহার গ্রামের সারবান লোহার এমনই নামী মানুষ, এমনই দামী মানুষ।'

দেবাংশী' গল্পটি সারনান লোহারের 'দেবাংশী'তে পরিণত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের কাহিনি বলা হয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে বিরাম গুণমান খেরা খেলা করতে এসে সারবান লোহারকে দেখে পাতাদের মাঝখানে এবং ঘোষণা করে 'উ ছাবাল যা-তা মনিষ্যি লয়, ই ছাবাল দেবাংশী।' তারপর রঘুনাথ মণ্ডলের কাছ থেকে পাঁচশ টাকায় সারবানকে কিনে নিয়ে যায়। সেই থেকে দেবাংশীর জীবন কাটাতে হয়।

সারবান লোহারের দেবাংশী শক্তির খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ক্ষমতার জোরেই সারবান অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পায় মানুষের কাছ থেকে। দৈত্যারির সঙ্গে কোবলা নিয়ে সেতু বর্মণের বিবাদ বাধলে সেতু বর্মণ সাহায্যের জন্য দেবাংশীর কাছে আসে। দেবাংশী ইয়তাকে সাহায্যের কথা বলে। দেবাংশীর এই কাজের জন্য দৈত্যারি দেবাংশীকে তার বাড়িতে ডেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। দেবাংশীকে অশ্রদ্ধা করার জন্য ভয় পায় দৈত্যারি। সেও তো এই পরিবেশেই মানুষ। উপরে যত তাচ্ছিলই দেখাক না, ভিতরে সে অস্থর হয়ে ওঠে এবং বউয়ের চোপার সামনে অপরাধীর মতোই মুখ করে থাকে।

পরিবেশের প্রভাব এমনই যে মানুষ যুক্তিগ্রাহ্য সত্য কথা বলতে ভয় পায়। দৈত্যারির স্ত্রী এই ঘটনায় স্বামীর অমঙ্গল হবে এই আশঙ্কায় দেবাংশীর বাড়িতে 'বড়ো সিধা পাঠায়'। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। দেবাংশীকে অপমান করার ছ'সাত দিন পরে দৈত্যারি সাপে কেটে মারা যায়। এই ঘটনায় ঐ অঞ্চলের সমস্ত মানুষের বদ্ধমূল ধারণা হয় দেবাংশীকে অপমান করার জন্যই দৈত্যারি সাপে কেটে মারা যায়। এর ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষের দেবাংশীর উপর আস্থা বেড়ে যায়। দেবাংশীর খ্যাতি

দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই দেবাংশীর কাছে আসতে থাকে নিত্যনতুন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। যে সমস্ত সমস্যার কথা সারবান লোহার তার পঞ্চাশ বছরের দেবাংশী জীবনে শোনেনি। সেতু বর্মণের বিষয়ে সারবান হস্তক্ষেপ করায় এবং দৈত্যারির মৃত্যুর পরে অনেকেই দেবাংশীর কাছে জমিজমার সমস্যা নিয়ে আসে। দেবাংশীর রায় মেনেও নেয়। যেমনটা রোহনী মেনে নেয়।

সারবান তার দেবাংশী জীবন থেকে মুক্তি পেতে বারবার দেবীর কাছে প্রার্থনা করে "মাও মাওরে ই দায় থিকা রেহাই দে মাও! মুই আর পারি না, মোক ছুটি করাই দে মাও!" তবুও সারবান লোহার ছুটি পাই না। গ্রামের মানুষরা যখন তার কাছে জমি জোতদার আধিয়ারের সমস্যা নিয়ে আসে তখন তার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়। কারণ সারবান তো বাল্যকাল থেকে এই সমস্যায় ভোগে যার সমাধান সে করতে পারে নি কেউ জানতে চায় না, কেউ খোঁজ নেয় না যে, সারবান লোহার এখনো সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে তার পৈতৃক পাঁচ বিঘা সম্পত্তি স্ব শাসনে আনার স্বপ্ন দেখে অথচ পারে না। এই স্ববিরোধ কেউ বোঝে না এমন কি তার স্ত্রী-পুত্ররাও নয়।

'দেবাংশী' গল্পটিতে দেখতে পাওয়া যায় জনচেতনার জাগরণ। সাধারণ মানুষ তার কাছে জমি জায়গার সমস্যা নিয়ে এলে সারবান লোহার বোঝে জমিদারের প্রবল অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা তার নেই। তার জন্য প্রয়োজন সংবদ্ধ জনচেতনার। গল্পের শেষে তার প্রকাশ ঘটে। সেতু বর্মণের মেয়ে বারুণীবালা যখন তার ধর্ষকদের শাস্তি দেবার জন্য দেবাংশীর কাছে আর্জি জানায় তখন সারবান লোহার বলে-

> "তুমরা যারা বাপ আছেন, ভাই আছেন, সোয়ামী আছেন, আপন আপন বেটির, বুনের, ইস্তিরির ইজৎ বাঁচাবার দায় তুমাহোরের সব্বার। তুমরা যদি সব্বাই চান ই পাপ বন্দ হউক, তবেই ই পাপ বপ্নদ হবে। ই দায় দেবাংশীর একার লয়।"[১৬]

শেষ পর্যন্ত বারুণীবালার ধর্ষক দৈত্যারির ছোট ছেলে বিনোদ সংবদ্ধ জনতার শিকার হয়।

এই গল্পে একদিকে যেমন আছে দেবাংশীর কথা তেমনি আছে সারবান লোহারের অন্তর্দ্বন্দের কথা, অপরদিকে সংবদ্ধ জনচেতনার কথা। সুতরাং গল্পটি শেষ পর্যন্ত লোকসংস্কারের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের সার্বিক উত্তরণের গল্প হয়ে ওঠে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'দেবী' গল্পে যেখানে ব্যক্তির ট্র্যাজিক পরিণতি দেখান তার থেকে এই গল্প আলাদা হয়ে যায় সারবান লোহারের উত্তরণের মধ্য দিয়ে।

'দেবাংশী' গল্পের মতোই দেয়াসিনির কথা পাওয়া যায় 'চোখে ঘুম নেই' গল্পে। সেখানে পাই ভিন্নতর বিশ্বাসের কথা। দেয়াসিনির 'কাছে মানুষের আবেদন বিচিত্র, তার নিদানও বিচিত্র। মানুষ তার কাছে সন্তান কামনায় নয়, দুরারোগ্য রোগ মুক্তির জন্য নয়, আসে ভোলার জন্য।' মানুষ তার কোনো গভীর শোক বা দুঃখ বা বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভোলার জন্য আসে। আর দেয়াসিনি তখন মন্ত্রপাঠ করে বিস্মৃতকামীর নগ্ন পিঠের উপর নিমের ডাল দিয়ে তিনবার সজোরে আঘাত করে ভুলে যেতে সাহায্য করে।

লছমনাবাঈ তার মেয়ে সুনালিকে নিয়ে গিয়েছিল দেয়াসিনির কাছে তার কোনো স্মৃতি ভোলার জন্য। দেয়াসিনির নিয়ম হচ্ছে বিস্মৃতকামীর নগ্ন পিঠে নিমের ডাল দিয়ে সজোরে তিনবার আঘাত করা তাহলে সে ভুলে যাবে। কিন্তু সুনালির নগ্ন পিঠে দেয়াসিনি তিনবার নয়, নয়বার আঘাত করেছে।তাতেও কোনো ফল হয়নি। সুনালি তার পুরোনো স্মৃতি ভুলতে পারে না। বরং শেষ পর্যন্ত সুনালি তার মেয়েকে কোলে নিয়ে নদীর জলে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এই গল্পে গল্পকার সুনালির যে পরিণতি দেখিয়েছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে গল্পকার লোকবিশ্বাসের কথা বললেও তিনি শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকেই প্রাধান্য দিতে চান। দেয়াসিনি তার নানা আভিচারিক ক্রিয়া প্রয়োগ করে ব্যর্থ হয়ে সুনালির মাকে বলেছে "ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে ইলাজ করা।" এই গল্পটি লোকসংস্কারের কথা বললেও তা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে লোকবিশ্বাসকে ভাঙার গল্প।

একই রকমভাবে লোকবিশ্বাসকে ভেঙে দেন 'ঈশানী মেঘ' ও 'ক্ষেত্রপাল' গল্পে। 'ঈশানী মেঘ' পানচাষীদের গল্প। পানচাষের কতকগুলি প্রতিবন্ধকতা আছে। যদি কোনোবছর ঝড়, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি হয় তবে পান চাষীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু 'নোনা, ধসা, পাথর আর জহর' এই চারশত্রুর হাত থেকে ধৈর্য মাহাতো তার গুপ্ত বিদ্যা প্রয়োগ করে নীলকণ্ঠ দাসের বরোজ রক্ষা করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। তাই তো গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে নীলকণ্ঠ যে দালান বাড়িতে বাস করে সেই দালান বাড়ি গড়ে ওঠার পেছনে ধৈর্য মাহাতোর হাত আছে। ধৈর্য মাহাতো যদি তার গুপ্ত বিদ্যা প্রয়োগ করে বরোজ রক্ষা না করত তবে তার দালান বাড়ি উঠত না। গ্রামের অন্যান্য চাষীরা লাভের আশায় ধৈর্য মাহাতোকে তাদের কাজের লোক করতে চায়। কিন্তু ধৈর্য মাহাতো যায় না।

একদিন প্রবল ঝড়ের রাতে ধৈর্য মাহাতো বরোজ রক্ষা করতে যায়। সে অশ্রাব্য গালিগালাজ ও কটু বাক্য প্রয়োগ করে, ঝড় বন্ধ করার চেষ্টা করে তাতে ব্যর্থ হলে সে মন্ত্র প্রয়োগ করতে থাকে। একই মন্ত্র সাতবার পড়ে এবং প্রতিবারের শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা প্রবল হাঁক ছাড়ে। কিন্তু ঝড়ের গতি আরো বাড়ে, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। ধৈর্য এবার কাপড় খুলে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে আবার মন্ত্র পড়ে, গালি দেয়, হাঁক পাড়ে, প্রশ্ন করে, অহংকার দেখায়। তাতেও ব্যর্থ হয়ে সে শেষ পর্যন্ত অশ্লীল ভঙ্গি সহকারে নৃত্য করে এবং শেষে বজ্রের আঘাতে মৃত্যু হয় ধৈর্য মাহাতোর।

যে ধৈর্য মাহাতোর গুপ্ত বিদ্যা সম্পর্কে গ্রামের মানুষের কোনো সংশয় ছিল না। গল্পকার সেই বিশ্বাসকে ভেঙে দেন। যেমনটা দেখা যায় 'ক্ষেত্রপাল' গল্পে। শিলদার পাথর পড়া, ওনাবৃষ্টি থেকে মাঠের ফসলকে রক্ষা করে আসছে। একদিন শিলদার শিলাবৃষ্টির রাতে মাঠে নামে ধান রক্ষা করতে এবং সেও শেষ পর্যন্ত মারা যায়। তখন সবাই বলেছিল যে শিলদার প্রাণ দিয়ে পাথারের ফসল রক্ষা করেছে।

প্রাকৃতিক শক্তির কাছে মানুষ যে কত অসহায় এই সত্যকেই গল্পকার প্রকাশ করেন লোকবিশ্বাসকে ভেঙে দিয়ে। তবুও যে সমস্ত মানুষ লোকবিশ্বাসের মধ্যে বাস করে তাদের গুণমানী, ওঝার প্রতি আস্থা কিছুমাত্র কমে না। 'দেবাংশী' গল্পে লিখেছেন:

> "সেই অবসন্ন ইন্দ্রিয়ে তার যা মনে আসত সে তাই করত। কোনটা লাগত কোনটা লাগত না। নিদান যদি ফলত, তার মাহাত্ম্যের কথা দশ-বিশ গ্রামে নতুন করে ছড়াত। যদি না ফলত, মানুষ প্রার্থনাকারীর কোনো ত্রুটি খুঁজে বার করত। বিশ্বাস এমনই।"[১৭]

লোকবিশ্বাস বিভিন্ন রকমের হয়। ডাইনি, ফোকসিন, বশকরা প্রভৃতিতে মানুষের বিশ্বাস আজও প্রবল। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে অভিজিৎ সেন 'জেহাঙ্গী', 'ডাইনি', 'পাথরে জিলের বিন্দু', 'স্ফ্রিংকস', মাটিরবাড়ি' প্রভৃতি গল্প লিখেছেন।

'জেহাঙ্গী' গল্পে দেখি জেহাঙ্গীর ভাসুরের ছেলে রেংটা ডাইন সন্দেহে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। রেংটার বাড়িতে একের পর এক বিপর্যয় ঘটে চলেছে। তার বড়ো ভাই খুন হয়, মা মারা যায়, বাবাও অসুস্থ হয়ে মারা যায়। একের পর এক এইসব ঘটনায় রেংটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে পাতরাস কবিরাজের কাছে যায়। পাতরাস কবিরাজ রেংটার পারিবারিক বিপর্যয়ের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা করে না। সে বলেছে যে কোনো লোক তাদের সর্বনাশ করছে, আর যে করছে সে তাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে থাকে। তাতে রেংটা নিঃসন্দেহ হয় যে তার কাকীই এই সর্বনাশ করেছে। তার পরেই সে তার কাকীকে ডাইনি সন্দেহে হত্যা করতে যায়।

'ডাইন' গল্পেও আছে এই একই সমস্যার কথা। গোচের ছেলে হয়ে মারা যায়। তখন গোচের সন্দেহ হয় 'ডাইনের নজর না থাকলে এমন হয় না।' সে নিশ্চিত হবার জন্য গুণমান নয়ন হোড়ের কাছে যায়। নয়ন হোড় অনেক ক্রিয়া-কর্ম ও অভিচার করে পান পাতার উপর। দালিকে পাতার উপর প্রতিফলিত মুখ দেখতে বলে। দালি মুখ দেখে নাম বলে তার ভাসুর সহা কিসকুর। কানুবেসরা নয়ন হোড়ের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে বলে, 'এ হতে পারে না, এ অসম্ভব আমি মানি না।' তখন আরও নিঃসন্দেহ হবার জন্য ডাকিনী বিদ্যাবিশারদ সিমন হেমরমকে নিয়ে আসা হয়। সেও একই নাম করে। তখন গোচ তার দাদা সহা কিসকুকে হত্যা করতে চায়। সহা কিসকু তার বন্ধুর বাড়িতে থাকায় পারে না। শেষ পর্যন্ত সেও বিশ্বাস করতে থাকে যে সে একজন ডাইন এবং উন্মাদের মতো হয়ে যায়। একদিন রাত্রে বাড়িতে ফিরে এলে গোচ তাকে হেসো দিয়ে কেটে ফেলে।তখন সাঁওতাল পাড়ার বৃদ্ধরা বলে 'তবে?' অর্থাৎ সহা কিসকু প্রকৃতই ডাইন ছিল এবং গোচ তার উপযুক্ত সাজা দিয়েছে। যেমটা রেংটার সমাজের সবাই চেয়েছিল জেহাঙ্গীর বলি।

'জেহাঙ্গী' ও 'ডাইন' গল্পদুটি যে পরিবেশে রচিত সেই সমাজের মানুষ ডাইনে বিশ্বাস করে। জেহাঙ্গী' গল্পের কয়েকটি সংলাপ উদ্ধৃত করে তাদের বিশ্বাসটা দেখতে পারি:

- কাকীকে মারার জন্য তোর দুঃখ হচ্ছে না? আফশোস?
- না!
- একটা মানুষকে এভাবে মেরে ফেলে -
- কাকী মানুষ না, ডাইন!...
- জেহাঙ্গী, কোনও মানুষ ডাইন হতে পারে, একথা তুমি বিশ্বাস কর?
- হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। আমার শাশুড়িকে সবাই আড়ালে ডাইন বলত, আমি সে কিথা বিশ্বাস করতাম।...

- আচ্ছা জলপা তুমি ডাইন বিশ্বাস কর?
- করি, স্যার।...
- জেহাঙ্গীর পক্ষে ডাইন হওয়া সম্ভব, একথা তুমি বিশ্বাস কর?
- জেহাঙ্গীর পক্ষে ডাইন হওয়া সম্ভব, স্যার।[১৮]

এখানে গুণীনদের কথা বাদ দিয়েছি কেননা তারাই তো রায় দেয় কে ডাইন আর কে ডাইন নয়, এবং প্রতিকারের চেষ্টাও করে। আমরা যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তারা জানি ডাইন বলে কিছু নেই। তবুও কি মানুষ তার মন থেকে এই বিশ্বাসকে সরাতে পেরেছে, পারেনি। আর পারেনি বলেই আজও সহা কিসকুদের মতো মানুষদেরকে গোচদের হাতে বলি হতে হয়।

'পাথরে জলের বিন্দু' গল্পেও একই পরিণতি দেখতে পাই। কৈলাস পাহান আনোপা, দানীদের গ্রামে বাস করতে থাকে পুষ্পা নামের এক মেয়েকে নিয়ে। কৈলাস পাহান কবিরাজি জানে। দানীদের গ্রামের সবাই বিশ্বাস করে 'এসব কবিরাজেরা হামেশাই ডাইন কিম্বা ফোকসিন হয়।' দানী তার স্ত্রীর জন্যে কৈলাস পাহানের কাছে ঔষধ আনতে গিয়ে পুষ্পার দ্বারা ধর্ষিত হয়। এই ঘটনার কিছু দিন পরে 'দানী একেবারে নিঃসন্দেহ হয় প্রেসাব করতে বসে।' অর্থাৎ কৈলাস পহান তার পরিবারের উপর ফোকসিন করেছে। তাদের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যখন 'আবিষ্কার করে বাড়ি সংলগ্ন তেমাথায় কলার খোলায় কিছু ফুল, আতপ চালের মুণ্ডা দুটি শোলার ঘোড়া ইত্যাদি আভিচারিক নির্দশন।' তখন গায়ের সমস্ত মানুষ মিলে কৈলাস পাহানকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই কাজ করে আনোপা ও দানী। মানুষকে ফোকসিন সন্দেহে হত্যা করা এর কারণ সন্ধান করতে গিয়ে গল্পকারকে বলতা শুনি:

> "আনোপা দানী এবং তাদের স্বজনেরা জানে জীবনে বড় বঞ্চনা, বেঁচে থাকা বড় সংশয়ের, জীবন অসংখ্য কারণে নিরাপত্তাহীন এবং সেই কারণগুলির কোনও অন্ধ অদৃশ্য উৎস আছে। সেই উৎস শুধু অদৃশ্য নয়, অন্ধকার এবং আদিম।"[১৯]

দানী ও আনোপার সমাজের সবাই জানে এই কাজ করার জন্য ধরা পড়লে তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে; তবুও তারা সেই কাজ করে। শেষে দেখতে পাই ধরা পড়ার পর দানী কঠোর শাস্তি সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

'স্ফিংকস্' গল্পে দেখতে পাই বশীকরণের চিত্র। আমাতী সুরঞ্জনকে বশ করার জন্য তেলপড়া, চিনিপড়া, নুনপড়া মিশিয়েছে তার খাবারে। এমনকি সুরঞ্জনকে পাওয়ার জন্য সে 'নিরাবরণ হয়ে বুড়ির থানে যায় মানত করতে।' শেষ পর্যন্ত সুরঞ্জন আমাতীর বশও হয়ে যায়। আমাতীর কাছ থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করলেও সে পারে না, সে দেখে তার জামার পকেটে গাছ। সেই গাছ ফেলে দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফিরে আসতে পারে।

'মাটিরবাড়ি' গল্পে লোকংস্কারের ব্যাপক প্রয়োগ দেখতে পাই। গোহীলালের জমিজায়গা বাড়ানোর কৌশলের কথা আছে এই গল্পে। সে তার পাশের জমিকে নিজের জমি করার জন্য দুই জমির মাঝ থেকে মাটি তুলে নানা ক্রিয়া করে এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দেয়। তখন দুজন দুজনার শত্রু হয়ে গ্রাম ছেড়ে দুই দিকে চলে যায় সেই জমি গোহীলালকে সামান্য দামে বিক্রি করে। 'গোহীলালের জমি এইভাবে বেড়েছে।'

গোহীলাল তার পরিবারের সুরক্ষার জন্য বড় ছেলের সদ্যোজাত শিশুর উপর নানা আভিচারিক ক্রিয়া করে গুণমানির সাহায্যে। তারপরে সেই শিশুকে মাটির হাড়ির ভিতর পুরে সরা দিয়ে মুখ এঁটে মাটির নীচে পুতে দেয়। কারণ তাদের বিশ্বাস ওই সদ্যোজাতের 'প্রেতাত্মা এক পুরুষকাল' তাদের 'ধনসম্পত্তি বাড়াবে এবং রক্ষা করবে'। পরের পুরুষের জন্য তাদের আবার ওই কাজ করতে হবে।

মঙ্গলকাব্যের সংস্কারকে নিয়ে রচনা করেন 'লখিন্দর ফিরে আসবে'। এই গল্পের প্রধান চরিত্র কমলসাধু, তার গুণমানির নানা আভিচারিক ক্রিয়ার কথা বলাই গল্পকারের উদ্দেশ্য। মঙ্গলকাব্যের যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতা আমাদের সমাজে আজও বর্তমান সেই ধারাটিকেই তিনি এই গল্পে প্রকাশ করেন। অশোকের বাল্যবন্ধু কমলসাধু, তাকে সে নানাভাবে তাচ্ছিল্য করলেও যখন শুনল যে কমলসাধু তিন দিনের সাপে কাটা বাসি মরাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য নদীর ধারে নানা অভিচার শুরু করেছে তখন কিন্তু তিনিও দেখতে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মনে মনে বলতে বাধ্য হন- 'জিয়াও, জিয়াও, সাধু তুমি ওকে জিয়াও।' পরেরদিন শুনতে পাওয়া যায় যে কমলসাধু মরাটিকে বাঁচিয়ে তুলেছে আর তা 'হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে'। এই গল্পে আমরা পরজন্ম ফলের কথাও পাই এবং তার প্রায়শ্চিত্ত করার কথাও রয়েছে।

৪

আজ আমরা যে সমাজ কাঠামোর মধ্যে বাস করি তার রূপ এইরকম ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে আমাদের সেই অতীত সমাজ কাঠামো ভেঙে গেছে। অতীতে কেমন ছিল আমাদের সমাজ কাঠামো তার এবং কিভাবে আমাদের কৌম জীবন ভেঙে গেছে, হারিয়ে যাচ্ছে সংস্কৃতি, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জীবিকা অর্জনের পথ, তার সন্ধান করেছেন 'ঋষির শ্রাদ্ধ' গল্পে।

ভীম ঋষির গল্প এটি। 'ভীম হাট খোলার দোকানে বসে খোল, ঢোল, ঢোলক ইত্যাদি নানা ধরনের যন্ত্র বানায়।' এই একটি বাক্যে গল্পকার আমাদের জানিয়ে দেন কেমন ছিল সমাজে গোষ্ঠীগত বৃত্তির বিভাজন। এক এক গোষ্ঠীর এক এক ধরনের বৃত্তি সমাজে নির্দিষ্ট ছিল। কামার অর্থাৎ কর্মকারেরা বানাবে লোহার জিনিসপত্র। কুমোর অর্থাৎ পালেরা বানাবে মাটির হাড়ি কলসি ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের কাজ পূজা-অর্চনা করা। আরও অনেক গোষ্ঠীগত বৃত্তির কথা বলা যেতে পারে তাতে কেবলই কলেবর বৃদ্ধি করা হবে। এই ছিল আমাদের অতীত সমাজ কাঠামো। এখানে কোনো বিরোধ ছিল না। বিরোধ দেখা দিল যখন আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া এসে লাগল কৌম জীবনের উপর। ভেঙে গেল কৌম সংস্কৃতি।

উন্নয়নের আধুনিক ব্যবস্থায় গ্রামের মানুষকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই ঋণ গ্রহণ করে ঋষি সম্প্রদায়ের দশজন লোক হাইস ডেয়ারি ও তাদের পেশার জন্য ঋণ নেয় ছ'জন, তাদের পেশার জন্য ঋণ নেয় চারজন, তার মধ্যে ভীম ঋষিও পড়ে। ঋষি সম্প্রদায়ের অন্যরা হাইস ডেয়ারির জন্য ঋণ নিলে ভীম ঋষি বলে: "ও কাজ আমাদের নয় ও ঘোষেদের কাজ।" ভীম ঋষির এই কথাই সত্য হয়ে ধরা দেয়। গল্পকথক বলেন:

> "তখনই আপনাকে বলেছিলাম গাই পোষা ঋষিদের কাজ নয়। আপনি শুনলেন না। দু মাসে হাপসে গেল সবাই। এক এক করে লোকসানে গাই বেঁচে নির্ঝঞ্ঝাট হল।"[২০]

এরকমটা হবার দাদা পরদাদা তার দাদার আমল থেকে ঋষিরা ঢাক-ঢোল, খোল মৃদঙ্গ করে আসছে, এখানেই তাদের স্বাভাবিক মুক্তি ছিল। ঋষিরা তাদের গোষ্ঠীবৃত্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় ও অন্য বৃত্তির মানুষেরা ঋষিদের বৃত্তি গ্রহণ করায় বিপর্যয় চরমে ওঠে। যে রামকেলির মেলাতে ঋষিরা পুরুষানুক্রমে খোল, মৃদঙ্গ বিক্রি করে আসছে সেই মেলাতে বৈষ্ণব গোষ্ঠী খোল মৃদঙ্গ সস্তা দামে বিক্রি করায় ভীম ঋষিরা চরম লোকসানের সম্মুখীন হয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠে আসে: "সাধুরা কি ঋষিদের মতো চামড়া কেটে খোল বানাতে শুরু করল নাকি? এ-কাজ তো তাদের নয়!"

অভিজিৎ সেন যখন ভীম ঋষির গল্প বলেন তখন তা শুধু ঋষি সম্প্রদায়ের গল্প থাকে না, তা আমাদের সমাজ কাঠামোয় যে কোনো সম্প্রদায়ের গল্প হয়ে ওঠে। সেই জন্যই গল্পকার গল্পের শেষে রেখে যান একগুচ্ছ প্রশ্ন:

> "আমাদের উন্নয়নের মডেলটা কি এরকম হওয়া উচিত ছিল? এরকম গোষ্ঠী বৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি? হাজার হাজার বছর ধরে উৎপাদনের যে গতিটা এসমাজ বয়ে এনেছে, ঔপনিবেশিক শাসনে তা ভেঙে পশ্চিমী মডেল ধরেছি আমরা, তাতে কারিগর, শিল্পী, পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ তৈরি হয় শিক্ষায়তনে। তাই কি এই ব্যর্থতা?তাই কি শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে আমরা এমন নিঃস্ব? আমাদের নিজস্ব মডেলের বিবর্তিত রূপের মধ্যেই কি আমাদের মুক্তি?"[২১]

৫...

অভিজিৎ সেন প্রতিকূল নানা পরিস্থিতে মানুষের অসহায় জীবনকে দেখেছেন। গ্রামীণ জীবনের প্রতিটি পল, অণুপলকে লক্ষ করেছেন, ব্যাঙ্কের কর্মচারী হিসেবে। তিনি জীবনকে ব্যক্তিকভাবে নয়, রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতির বহুমাত্রিকতাকে জড়িয়ে দেখেছেন। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি আমাদের উৎসভূমিকে চিনিয়ে দেওয়ার বয়ান। তিনি এই বয়ান নির্মাণ করেন প্রথাগত বয়ানের বিপরীতে। এই বয়ানে তাই আধুনিকতা সম্পর্কে সংশয় ও জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে নানা সংস্কার বিশ্বাস লৌকিক-অতিলৌকিকের অসংখ্য উপাদান। অভিজিৎ সেন তাকে উপেক্ষা করেন বরং তাকেই করেছেন গল্পের বিষয়। অভিজিৎ সেন তার গল্পে লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাসকে রূপায়ণের মাধ্যমে সন্ধান করেছেন আমাদের অতীত ইতিহাসকে। তিনি 'মিথ ও লোককথার সম্ভবনা' প্রবন্ধে লিখেছেন:

> "মিথ ও লোককথার মধ্যে একটা গোটা সমাজের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে খুঁজলে পাওয়া যাবে বলে আমারও বিশ্বাস। আমাদের লেখালেখির বিষয়বস্তু এবং চরিত্রগুলোকে এভাবে চিনবার এবং চেনাবার চেষ্টা খুব একটা বেশি হয় নি।"[২২]

এই জন্য তিনি তাঁর লেখালেখির বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন সেই জগতকে এবং তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অভিজিৎ সেনের গল্পের আলোচনায় সেই বিষয়টিই দেখাবার চেষ্টা করলাম।

তথ্যসূত্র:

১। সেন অভিজিৎ, মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা, নিসর্গপত্র পত্রিকা, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ১৮৮ ।
২। সেন অভিজিৎ, পঞ্চাশটি গল্প, কলিকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, ২০০০,প্রথম সংস্করণ, ভূমিকা ।
৩। ঘোষ প্রসূ। অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প: একটি বিশ্লেষণ, জনপদপ্রয়াস, শীল, বিকাশ (সম্পাদিত), কলকাতা, ৭০০০০৯, জানুয়ারি,২০০৬, পৃষ্ঠা: ১১২-১১৩।
৪। সেন অভিজিৎ, পঞ্চাশটি গল্প, কলিকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, ২০০০,প্রথম সংস্করণ। পৃষ্ঠা: ২৪০।
৫। তদেব পৃষ্ঠা: ২৪৫-৪৬।
৬। তদেব পৃষ্ঠা: ২৪৬।
৭। তদেব পৃষ্ঠা: ২।
৮। তদেব পৃষ্ঠা: ২৪৯।
৯। সেন অভিজিৎ, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, ২০০০,প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২৭৫।
১০। তদেব পৃষ্ঠা: ২৬৯।
১১। তদেব পৃষ্ঠা:২৮।
১২। সেন অভিজিৎ, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, ২০০০,প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৯-১০।
১৩। তদেব পৃষ্ঠা: ১১।
১৪। সেন অভিজিৎ, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, ২০০০, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৪৫০।
১৫। সেন অভিজিৎ, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, ২০০০,প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১০৯।
১৬। তদেব পৃষ্ঠা: ১৩৫।
১৭। তদেব পৃষ্ঠা: ১১০।
১৮। সেন অভিজি, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, ২০০০,প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৩৫৩-৩৬৪।
১৯। সেন অভিজিৎ, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, ২০০০,প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৮৬।
২০। সেন অভিজিৎ, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, ২০০০,প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১৮৯।
২১। তদেব পৃষ্ঠা: ১৯০।
২২। সেন অভিজি, মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা, নিসর্গপত্র পত্রিকা, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ১৮৮।